বিজ্ঞানীরা অবশ্য এ দুই সম্ভাবনার মাঝামাঝি আরেকটি সম্ভাবনাকেও হাতে রেখেছেন। এর নাম দেয়া যাক- 'বদ্ধ-প্রায় মহাবিশ্ব' (marginally bounded universe)। এ ধরনের মহাবিশ্ব সবসময়ই প্রসারিত হতে থাকবে ঠিকই, কিন্তু একেবারে দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে- অনেকটা পাশ-নম্বর পেয়ে কোনও রকমে পাশ করে যেতে থাকা ছাত্রদের মতন। আমাদের রকেটের উদাহরণে ঠিক নিষ্ক্রমণ বেগের সমান (এর বেশিও নয়, কমও নয়) বেগ দিয়ে রকেটটিকে উৎক্ষেপণ করলে যে রকম অবস্থা হত, অনেকটা সেরকম। মহাবিশ্বের পরিণতির এই তিন ধরনের সম্ভাবনাকে ৫নং ছবিতে দেখানো হয়েছে।

এখন কথা হচ্ছে, আমাদের মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের পরিণতি ঘটতে যাচ্ছে তা বোঝা যাবে কীভাবে? আবার কিন্তু সামনে চলে আসছে মহাবিশ্বের ঘনত্বের প্রসঙ্গটি। মহাবিশ্বের ঘনত্ব বলতে সমগ্র মহাবিশ্ব যে জড়পদার্থ দিয়ে তৈরি তার ঘনত্বের কথাই বলছি। পদার্থের পরিমাণ যত বেশি হবে মহাবিশ্বও তত ঘন হবে, আর সেই সাথে বাড়বে প্রসারণকে থামিয়ে দেয়ার মতো মহাকর্ষের শক্তিশালী টান। জিনিসটি বুঝতে আবার আমাদের রকেটের উদাহরণে ফেরত যেতে হবে। রকেটের ওজন যত বেশি হবে মাধ্যাকর্ষণ পেরিয়ে নিষ্ক্রমণ বেগ অর্জন করতে তাকে তত বেশী কষ্ট করতে হবে। ঠিক তেমনিভাবে, মহাবিশ্ব উচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট হলে প্রসারণকে থামিয়ে দিয়ে সঙ্কোচনের দিকে ঠেলে দেয়ার মতো যথেষ্ট পদার্থ এতে থাকবে - ফলে মহাবিশ্ব হবে বদ্ধ (bound)। আর কম ঘনত্ব বিশিষ্ট মহাবিশ্ব সঙ্গত কারণেই হবে মুক্ত (unbounded)- যা প্রসারিত হতে থাকবে অনন্তকাল ধরে। তাহলে এর মাঝামাঝি এমন একটা ঘনত্ব নিশ্চয়ই আছে যার উপরে গেলে মহাবিশ্ব একসময় আর প্রসারিত হবে না। সন্ধি বা ক্রান্তি ঘনত্ব (critical density) হচ্ছে সেই ঘনত্ব যা মহাবিশ্বের প্রসারণকে থামিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। বিজ্ঞানীদের ধারণা এর মান প্রতি কিউবিক মিটারে ১.১×১০^{-২৬} কিলোগ্রামের মতন। মহাবিশ্বের প্রকৃত ঘনত্ব (actual density) আর ক্রান্তি ঘনত্বের (critical density) অনুপাতকে পদার্থবিদরা খুব গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন, যা ওমেগা (Ω) প্রতীকে প্রকাশ করা হয়। এই ওমেগার মান ১ এর কম ($\Omega<1$) হলে মহাবিশ্ব হবে উন্মুক্ত বা অনন্ত (open/unbounded)। আর ওমেগার মান ১ এর বেশি ($\Omega>1$) হলে মহাবিশ্ব হবে বদ্ধ বা সংবৃত (closed/bounded)। আর ওমেগার মান পুরোপুরি ১ ($\Omega=1$) হলে প্রসারণের হার ধীরে ধীরে কমে যেতে যেতেও টায়ে টায়ে প্রসারিত (flat/marginally bounded) হতে থাকবে শেষপর্যন্ত, অনেকটা সেই কোনরকমে পাশমার্ক পেয়ে পাস করে যাওয়া ছাত্রের মতো। কাজেই, এক হল ওমেগার সীমান্তিক মান।

সম্ভাবনাগুলোর কথা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু মহাবিশ্বের আসল ঘনত্ব না জানলে তো হলফ করে বলা যাচ্ছে না ভবিষ্যতে আমাদের মহাবিশ্বের জন্য আসলে ঠিক কী অপেক্ষা করছে! তাহলে তো মহাবিশ্বের প্রকৃত ঘনত্ব জানতেই হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত ঘনত্ব বের করার উপায় কি? একটা উপায় হলো মহাশূন্যের সকল দৃশ্যমান গ্যালাক্সির ভর যোগ করে তাকে পর্যবেক্ষিত (observed) স্থানের আয়তন দিয়ে ভাগ করা। মহাবিশ্বের একটা গড় ঘনত্ব এভাবে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মুশকিল হলো, এভাবে হিসাব করে ঘনত্বের যে মান পাওয়া

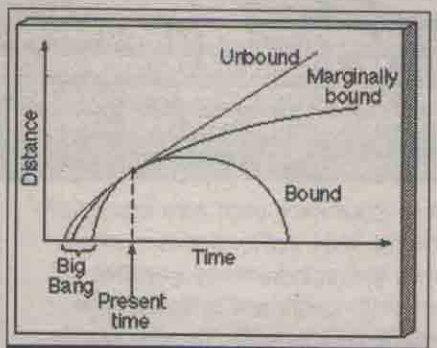

মহাবিশ্বের পরিণতির সম্ভাবনা

যায়, তা খুবই কম, সন্ধি ঘনত্বের শতকরা ১-২ ভাগ মাত্র। তার মানে ঠিক কি দাঁড়ালো? দাঁড়ালো এই যে এই মান সঠিক হলে ওমেগার মান দাঁড়ায় ১ এর অনেক অনেক কম। তাহলে আমাদের সামনে চলে আসলো সেই উন্মুক্ত বা অনন্ত মহাবিশ্বের মডেল। তার মানে কি এই যে, মহাশূন্য কেবল প্রসারিত হতেই থাকবে? না, তা নিশ্চিতভাবে এখনই বলা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা এত সহজ নয়। বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যেই প্রমাণ পেয়েছেন যে, আমাদের দৃশ্যমান পদার্থের বাইরেও মহাশূন্যে এক ধরনের রহস্যময় জড়-পদার্থ রয়েছে যাকে বলা হয় অন্ধকার বা গুপ্ত জড় (Dark Matter)। এই অদৃশ্য জড়ের (পদার্থের) অস্তিত্ব শুধু গ্যালাক্সির মধ্যে মহাকর্ষের প্রভাব থেকেই জানা গিয়েছে, কোনও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ থেকে নয়। বিজ্ঞানের জগতে এমন অনেক কিছুই আছে যা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গৃহীত হয়নি, হয়েছে পরবর্তী সময়ে পরোক্ষ প্রমাণ, অনুসিদ্ধান্ত বা ফলাফল থেকে। তবে তাই বলে সেগুলো বিজ্ঞান-বিরোধীও নয়। যেমন, মহাবিস্ফোরণ বা বিগ-ব্যাং এর ধারণা। কেউ চোখের সামনে এটি ঘটতে দেখেনি। কিন্তু মহাজাগতিক পশ্চাৎপট বিকিরণ বা কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন (cosmic background radiation) সহ পরোক্ষ প্রমাণগুলো কিন্তু ঠিকই মহা বিস্ফোরণ তত্ত্বকে বিজ্ঞানের জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমনি আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে বিবর্তনবাদ - যার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব হলেও অসংখ্য পরোক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতেই 'আদম-হাওয়া' ধরনের বিশ্বাস-নির্ভর সৃষ্টিতত্ত্বকে হটিয়ে তা বিজ্ঞানের জগতে জায়গা করে নিয়েছে।

আবার আমরা অন্ধকারময় গুপ্ত জড়-পদার্থের জগতে ফিরে যাই। কীভাবে জানা গিয়েছিল এই অদৃশ্য জড়ের অস্তিত্ব?

এই বিষয়ে কথা বলতে হলে ভেরা রুবিনের প্রসঙ্গ টানতে হবে। তিনিই সর্বপ্রথম আমাদের ছায়াপথ আর অন্যান্য সর্পিলাকার গ্যালাক্সিগুলোতে অন্ধকার অর্থাৎ লুকিয়ে থাকা জড়ের বা ডার্ক ম্যাটারের অস্তিত্বকে অত্যন্ত জোড়ালোভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত: রুবিনের কাজই পরবর্তী সময়ে টনি টাইরনের মতো জ্যোতির্বিদদের গুপ্ত জড় সম্পর্কে গবেষণায় আগ্রহী করে তোলে। ব্যাপারটি একটু ব্যাখ্যা করা যাক।

আমাদের গ্যালাক্সি কেন্দ্র থেকে অনেক দূরবর্তী নক্ষত্ররাজির গতিবেগ কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থিত নক্ষত্ররাজির বেগের তুলনায় কম হওয়ার কথা; ঠিক যেমনটা ঘটে আমাদের সৌরজগতের ক্ষেত্রে। সূর্য থেকে যত দূরে যাওয়া যায়- গ্রহগুলোর গতিবেগও সেই হারে কমতে থাকে। কারণটা খুবই সোজা। নিউটনের সূত্র থেকে আমরা জেনেছি যে, মাধ্যাকর্ষণ বলের মান দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ দূরত্ব বাড়লে আকর্ষণ বলের মান কমবে তার বর্গের অনুপাতে। টান কম হওয়ার জন্য দূরবর্তী গ্রহগুলো আস্তে চলে। আমাদের ছায়াপথের ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম ঘটনা ঘটবার কথা। কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী নক্ষত্রগুলো তাদের কক্ষপথে কেন্দ্রের কাছাকাছি নক্ষত্রগুলোর চেয়ে আস্তে ঘুরবার কথা। কিন্তু রুবিন যে ফলাফল পেলেন তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। দূরবর্তী নক্ষত্রগুলোর ক্ষেত্রে গতিবেগ কম পাওয়া তো গেলই না বরং একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের পর সকল নক্ষত্রের দ্রুতি প্রায় একই সমান পাওয়া গেল। অন্যান্য সর্পিলাকার গ্যালাক্সিগুলো (যেমন অ্যান্ড্রোমিডা) পর্যবেক্ষণ করেও রুবিন সেই একই ধরনের ফলাফল পেলেন। তার এই পর্যবেক্ষণ জ্যোতির্বিদদের ভাবনায় ফেলল। হয় রুবিন কোথাও ভুল করেছেন, অথবা এই গ্যালাক্সির প্রায় পুরোটাই এক অজ্ঞাত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জড়পদার্থে পূর্ণ। রুবিন যে ভুল করছেন না এই ব্যাপারটা আরো ভালভাবে বুঝা গেল অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি পর্যবেক্ষণ করে। দেখা গেল ২২ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের এই গ্যালাক্সিটি ঘণ্টায় প্রায় ২ লাখ মাইল বেগে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। এই অস্বাভাবিক গতিবেগকে মহাকর্ষ জনিত আকর্ষণ দিয়েই কেবল ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু দৃশ্যমান জড়পদার্থ তো পরিমাণে অনেক কম ফলে